পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা নাটকে মিথের প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা নাটকে মিথের প্রভাব

বাংলাদেশে মধ্যযুগ থেকে সংস্কৃতচর্চা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। তার ওপর মুসলমান শাসনের আমলে এসে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ লোকজীবনে যাত্রা জনপ্রিয় ছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য যে যাত্রাভিনয় করেছেন সে তথ্য সর্বজনবিদিত।[১] উনিশশতকে বাংলা নাটক অভিনয় শুরু হবার আগে নাট্যগীত, লোকনাট্য ও কৃষ্ণযাত্রার বহুল প্রভাব ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র আনন্দ প্রকাশের প্রাথমিক মাধ্যম নাচ ও গান, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় অভিনয়। সম্পূর্ণ নাটক না হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ ও তাঁর পরবর্তী কবিদের রচনা, যেমন বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' অভিনয়ের চাহিদা কিছুটা পূরণ করত। সাধারণ মানুষের জন্য ছিল ঝুমুর, ধামালি ও ঢামালি, কথকতা, জাগ-গান, গম্ভীরা, ছৌ-নাচ। এ সবেরই বিষয়বস্তু ধর্ম ও পুরাণকথা। অনেক পণ্ডিতের মতে যাত্রা আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির যুগ থেকে ছিল। 'শিল্প' ও 'কলা' এই দুটি শব্দই মূলত দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। বুদ্ধদেবের সময় থেকে নাট্যকলার চর্চা দেখা গিয়েছে।[২] অধ্যাপক সুকুমার সেন বলছেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের আবির্ভাব নটকর্ম প্রচলিত হবার অনেক পরে। ঋগ্বেদের কয়েকটি সুক্তে নাটকের বীজ আছে তবুও কেন যে নাটক সৃষ্টি হতে দেরি হল তার কারণ বোঝা শক্ত নয়।"[৩] ভরতমুনি যাত্রাকে বলেছেন ওড্র মাগধী রীতি। অন্যত্র দেখি, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা 'নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন "তিনি দাক্ষিণাত্যে 'মারীযাত্রা' বলে, এক ধরনের অনুষ্ঠান দেখেছেন। এবং পূর্বসমুদ্রের তটবর্তী এলাকায় জেলেদের মধ্যে 'যাত্রে' নামে একটি পার্বণ নাকি এখনও প্রচলিত"।[৪] অতএব যাত্রা আঞ্চলিক শব্দও হতে পারে। সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "নাট্যকর্মের ঐতিহাসিক প্রবাহ বাংলাদেশে দুটি ধারায় বয়ে এসেছে। অন্তত অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে যে অল্পস্বল্প আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এবং এখনও পর্যন্ত শহর থেকে দূর পল্লীকোণে যে নেটোর নাচ, কাচ (প্রাচীনতর নাটুয়া নৃত্য, কৃত্য) প্রায় অবলুপ্ত আছে তার থেকে যতটা অনুমান করা যায় সে দুটি ধারা হল গীত নাট ও নাটুয়া কাচ। গীত নাট হল 'যাত্রা', নাটুয়া কাচ হলো লেটো। ..... মধ্য বাংলায় কাচ কাচা = রং মাখা, সাজপরা যাকে সংস্কৃত বর্ণিকা পরিগ্রহ বলা হয়।"[৫]

কলকাতা শহর পত্তনের সঙ্গে আমাদের জীবনে যে নাগরিকতা এল তা কোনো সুস্থ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসে নি । কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হওয়ায় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পটভূমিকা একেবারে বদলে গেল । কৃষিজীবী, একান্নবর্তী, প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের বদলে এল, চাকরি বা ব্যবসাজীবী সম্প্রদায় । শহরে অনেকেই অর্থ উপার্জনের জন্য পরিবার আনতেন না । অতএব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগও হল যেমন, তেমন স্বাধীনভাবে অভিভাবকবর্জিত জীবনযাত্রার জন্য চলতি নাগরিক বিলাসে গা ভাসাবারও সুযোগ হল । গ্রামে ছিল বিনিময় প্রথা, এখন 'কাঁচা টাকা' । ফলে ভোগের স্রোতে ধনী দরিদ্র গা ভাসিয়ে দিল ।

যাত্রা এল আবার । কিন্তু এখন তার ধর্ম হল আমোদ বা বিনোদন । অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিদ্যাসুন্দরের কদর খুব বাড়ল । এটি এখন অভিনীত হতে থাকল ধনীর বৈঠকে, শহুরে বারোয়ারি মঞ্চে । প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এসে থমকে গেল । এমন-কি পৌরাণিক কাহিনী নলদময়ন্তী হল 'সং' — 'ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে ।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত পাঁচালী, কবিগান, তর্জার সঙ্গে যাত্রাও জোর কদমে চলে । কিন্তু উনবিংশ শতকে শিক্ষিত বাঙালি যখন ইংরিজি নাটকের রসাস্বাদন করলেন তখন তাঁরা এইসব আসর থেকে সরে এলেন । তাই যাত্রা চলে গেল গ্রামের দিকে, তথাকথিত অশিক্ষিতের মধ্যে । অতএব রুচির স্থূলতা বাড়ল, শহরে অনাদরণীয় বলে গ্রামে চলে গেল । এমে শিক্ষিত জনসাধারণের মন থেকে যাত্রা মুছেই গেল । যদিও অধুনাকালে যাত্রা আবার ফিরে আসছে, কিন্তু রূপের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন করা হয়েছে । কারণ বর্তমান ফিল্ম, দূরদর্শন, নাটকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিকতার মধ্যে টিকে থাকতে হলে কলাকৌশলের দিক থেকে তাকে বদলাতেই হবে । কিন্তু তার সুপ্ত প্রভাব থেকে গেছে নাটকের মধ্যে । আবেগের বাহুল্যে, গানের অতি ব্যবহারে । 'বাংলার অভিনয় পদ্ধতি হচ্ছে কথকতার বংশধর "কথা কইতে কইতে গান গেয়ে ওঠা যাত্রারও নিয়ম ছিল, থিয়েটারেও নিয়ম, বাংলা সিনেমারও নিয়ম ।"[৭]

১৭৭৫ সালে (২২·১১·৭৫ ও ২১·৩·৭৬) তারিখে হেরাসিম লেবেডফের নাট্যপ্রচেষ্টা

একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা । কিন্তু বাঙালির নাট্যপ্রীতি তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন ।

প্রথম যুগে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে নিজস্ব রঙ্গশালায় যে-সব নাটক অভিনয় হয়েছে তার নাট্যকার ছিলেন প্রধানত তিনজন । রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার মূলত সংস্কৃত নাটক ভিত্তিক, মনোমোহন বসু পৌরাণিক ও প্রহসনাত্মক এবং মধুসূদন পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক নাটকও লিখেছেন । "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন নাটক লেখা এবং নাটকাভিনয়ের চল বাড়ল তখন যে সব নাটক লেখা হয় তার নাটকাভিনয়ের মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' আছে, 'নীলদর্পণ' আছে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আছে — যেগুলো তৎকালীন বাঙালি সমাজের সমস্যা নিয়ে লেখা । বুঝতে পারি নাট্যকাররা কি পরিমাণ দায় বোধ করতেন তখন সমাজ সম্পর্কে ।"[৮] কিন্তু সামাজিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি নাটক রচিত হয়েছিল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে ।

তার অন্যতম কারণ আমাদের দেশে পুরাণের প্রবল প্রভাব । সমাজনীতি, ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ, ধর্মশিক্ষা বহুলাংশে পুরাণ থেকে গৃহীত । প্রাচীন গ্রীক ও রোমক কাহিনীর মতো এগুলি সে যুগেই সীমিত হয়ে নেই । আজও ভারতীয় মননে পুরাণ বিশাল স্থান নিয়ে আছে । যে অর্থে অডিসি ইলিয়াডকে মহাকাব্য বলা হয়, রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষেত্রে তার অর্থ ভিন্নতর । এ দেশে এ দুটি কাব্যে মানুষ তার সহস্র ভুল ত্রুটি এবং সেইসঙ্গে তার অপার মহত্ব দিয়ে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করছে । "প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতকে কাব্য বা সাহিত্যের কোনও শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলা যায় না । ..... এ দুটি নিজেরাই এক স্বতন্ত্র শ্রেণী রচনা করছে । এ ক্লাস বাই দেমসেলভ্স্ ।"[৯]

বৈদিক যুগে আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ছিল । তা ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণরাই এ কাজের উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়ায় অন্য বর্ণের মানুষের সঙ্গে তার যোগও কম ছিল । পুরাণের মাধ্যমে জ্ঞান প্রচার হওয়ায় সাধারণ মানুষের উপকার হল । কাহিনীর আকর্ষণ তো আছেই তা ছাড়া আমাদের দেশের রীতিনীতি জীবনচর্যা সবেরই পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণ থেকে । এমন-কি ভূগোল পরলোক, প্রাণীতত্ত্ব, কৃষিকার্য, পশুপালন, পূজাপ্রকরণ, বিবাহ প্রথাও আলোচিত হয়েছে সমাজনীতি রাজনীতি, ধর্মনীতির সঙ্গে ।

পুরাণ একাধারে আমাদের ইতিহাসও । ব্যাসদেব দাবি করেছেন তাঁর মহাকাব্যে ইতিহাস উপস্থিত আছে । মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে বেদবাদিরা ইতিহাস জানার জন্য পুরাণ পাঠ করে । পুরাণে বহু নদী, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় । স্কন্ধপুরাণ বায়ুপুরাণে সেই কথা বলা হয়েছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে । স্কন্ধপুরাণ, 'contains like Markandeya, Brahma, Matsya and Vayu, the longer lists of countries and people of India.' ..... 'ভবিষ্য পুরাণের মধ্যে কলিযুগের রাজকাহিনীর ইতিহাস পাওয়া যায় । ..... শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র, গুপ্ত ইত্যাদি রাজবংশের ইতিহাসও পুরাণের পাতায় আছে ।"[১০]

তবে সময়ের দূরত্ব থেকে দেখা বলেই হয়তো পুরাণে ইতিহাসের তথ্য থেকে কাহিনী বড়ো হয়ে উঠেছে । বলার ভঙ্গিটি মৌলিক । এক তো স্মৃতিনির্ভর, তার ওপর ভারতীয় বিশ্বাস মানুষ যন্ত্র, ঈশ্বর যন্ত্রী, কিছুই আমাদের ওপর নির্ভর করছে না । এমন-কি, সৎ কাজ করার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাও ভগবানের দান । এই মনোভাবের জন্য পুরাণকাররা সূত্রের দিকে নজর রাখতেন না । বস্তুত, ভারতীয়দের কোনো স্পষ্ট কালানুক্রমিক ইতিহাস নেই । কারণ স্পষ্ট । "মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে । অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনে প্রয়োজন নাই । এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি ইতিহাস না থাকার কারণ ।"[১১]

আমাদের জীবন এইভাবে পুরাণ-প্রভাবিত হবার ফলে নাটকে তার প্রভাব আসাই স্বাভাবিক । নাট্যচর্চার প্রথম দিকে ইংরিজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দিয়ে নাটক শুরু হল । প্রথম মৌলিক নাটক লিখলেন তারাচরণ শিকদার, ভদ্রার্জুন - মহাভারত থেকে সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রেমকাহিনী নিয়ে ।

বাংলা নাটকের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দুটি নাটকে পুরাণকাহিনী নিয়েছেন । তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেমন রামায়ণ কাহিনীর পরিবর্তন না ঘটিয়ে মূল্যবোধের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, নাটকের ক্ষেত্রে তা করেন নি । প্রকৃতপক্ষে নাটক রচনা তাঁর ছিল চ্যালেঞ্জ । 'রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস' দেখতে গিয়ে মধুসূদন গৌরদাস বসাকের কাছে দু:খপ্রকাশ করেন নাটকের দীনতা বিষয়ে এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই দীনতা নিরসনের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন ।

হিন্দুপুরাণ তাঁর কবিকল্পনা চিরদিন উদ্দীপ্ত করেছে। কবিতা প্রসঙ্গে, রাজনারায়ণ বসুকে ১৫ জুন ১৮৬০ সালে লেখা চিঠি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকেই আবার লিখছেন, "I like a subject with oceanicand mountain scenary, with sea-voyages, battles and love adventures. It gives a fellow's invention such a wildscope."[১২]

তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় নাটক যথাক্রমে শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীতে নায়ক-নায়িকা নির্বাচন, বিদূষকের অস্তিত্ব, ঋষির অভিশাপ অথবা দেবতাদের চক্রান্তে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি, উপসংহারে মিলন ও শান্তিবচন ইত্যাদি সবেতেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে আধুনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। দেবযানী আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। যযাতি ও শর্মিষ্ঠার গোপন পরিণয়ের কথা শুনে তাঁর প্রেম প্রতিহিংসায় পরিবর্তিত হয়েছে। তখন পত্নীদের কর্তব্য ছিল স্বামীতে অনুগত থাকা সব অবস্থায়। দেবযানী কিন্তু আধুনিকা নারীর মতো প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। আবার, পিতা শুক্রাচার্য যখন তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে যযাতিকে জরাগ্রস্ত করে দিলেন তখন শাশ্বত নারীর মতো যন্ত্রণা ও দু:খ পেয়েছেন। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠা চিরকালীন ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন। তাঁর প্রতিবাদ নেই, প্রতিক্রিয়া নেই। ক্ষমাসুন্দর সীতার আদর্শে রচিত। তবু একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে শর্মিষ্ঠা রুক্ষভাষী। কিন্তু অদৃষ্টের প্রভাবে রাজকন্যাকে যখন দাসীবৃত্তি করতে হয়, মমতাময় কবিমন তাঁর অদৃষ্ট পরিবর্তন করতে না পারলেও কাব্যলক্ষ্মীর বিজয়মাল্য তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেন।

'পদ্মাবতী' নাটকের বহিরঙ্গে ভারতীয় ও অন্তরঙ্গে গ্রীক মিথ কাজ করছে। 'শর্মিষ্ঠা' প্রসঙ্গে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, বিদেশ থেকে — 'can borrow a neck tie, even a waist coat, but not the whole suit.'[১৩] পদ্মাবতী' নাটক সম্বন্ধে এ মন্তব্যটি প্রযোজ্য। গ্রীক পুরাণের 'Apple of discord' - এ হেলেন, জুনো ও মিনার্ভার মধ্যে রূপ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। মধ্যস্থ করতে রাজকুমার প্যারিসকে ডাকা হয়। জুনো লোভ দেখালেন, তাঁকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ঘোষণা করলে মর্তের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ট্রয়ের হেলেনকে পেতে সাহায্য করবেন। হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের সূচনা এইভাবে। এখানে ভারতীয় পটভূমিতে শচী, রতি ও মুরজার দ্বন্দ্ব, মধ্যস্থতা করতে ডাকা হয় রাজা ইন্দ্রনীলকে।

পুরস্কার পদ্মাবতী লাভ। এ নাটকে নায়িকা কিন্তু শচী। শচী ও রতির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুরজার দ্বিধা দ্বন্দ্ব, তার মধ্যে মানবচরিত্রগুলি অসহায়ভাবে ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়েছে। এ নাটকেও সংস্কৃত নাটকের আদর্শ রক্ষিত ।

'মায়াকানন' নাটকটি সমালোচকদের দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত হয় নি। এটি মধুসূদনের শেষ রচনা। পীড়িত, দুশ্চিন্তা ও দুর্দশাগ্রস্ত কবি তখন সৃষ্টির শিখরচূড়ে ছিলেন না। কিন্তু কল্পনার প্রগাঢ়তায় এটিও অসামান্য। এটি সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনী। কিন্তু পুরাণাশ্রিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এ নাটকে অবতীর্ণ হচ্ছেন। পূর্বজন্মে দুর্বাশার শাপের ফলে এ জীবনে অজয় ও ইন্দুমুখীর মিলনে বাধা পড়েছিল এইটুকু পুরাণপ্রভাব এসেছে। মিথিক চরিত্রগুলি মধুসূদন এইভাবে সাজিয়েছেন কারণ দুর্বাশা পুরাণে চিরকাল অকারণে ক্রোধী বলে পরিচিত।

মধুসূদনের সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বাস্তবমুখী বিষয় নিয়ে নাটক লেখা পছন্দ করতেন। একমাত্র 'নবীন তপস্বিনী' প্রাচীন যুগ নিয়ে লেখা। মিথ যদিও তেমনভাবে তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি, কিন্তু আমরা ভারতীয়রা মিথ ভাবনার পরিমন্ডলে এমনই লিপ্ত হয়ে বাঁচি যে প্রায়ই তার ছায়া দেখা যায়। যেমন নীলদর্পনের নায়ক নবীনমাধবকে তাঁর পিতা সাদরে নাম দিয়েছিলেন 'স্বরপুর-বৃকোদর'। নাটকের ঘটনা ঘটে স্বরপুর নামক গ্রামে, বৃকোদর অর্থ ভীম। ভীম মহাভারতে সর্বত্র বিপদের সময় আপন দৈহিক শক্তির ওপর ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তা কীচক বধই হোক বা জয়দ্রথকে শাস্তি দেওয়াই হোক। নবীনমাধব তেমনি গ্রামের লোকের দু:খের দিনে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এগিয়ে যেতেন, যার পরিচয় পেয়েছি আমরা ক্ষেত্রমণি উদ্ধারের সময়। ক্ষেত্রমণি নাম নির্বাচনেও মিথ প্রভাব কাজ করেছে। ক্ষেত্র+মণি অর্থাৎ ভূমি, মাটি, বসুন্ধরা+শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ, উর্বর। তার ওপর রোগের অত্যাচার স্বতই দু:শাসন দ্বারা দ্রৌপদীর অত্যাচারের কথা যেমন মনে করায় তেমনই মনে করায় পরের যুগের রওকরবী নাটকের কথা। সেখানেও মা বসুন্ধরার আঁচল নিয়ে টানাটানি চলে লোভ ও প্রতিপত্তির। অন্যান্য নাটকেও অজস্র মিথের উল্লেখ আছে। 'নবীন তপস্বিনী'তে গুরুপুত্রকে ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে, 'দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন', জগদম্বাকে 'শূর্পণখা'। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে শাস্ত্রের বিচারে বিধবাবিবাহের সমর্থন আলোচনা করে অকালবিধবা দুই বোন গৌরীমণি ও তারামণি। তারা ও মন্দোদরীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা আসছে এ প্রসঙ্গে। 'ছি: ছি: কার' দিতে 'মহাভারত মহাভারত'

বলা দেশীয় রীতি। ঐ নাটকটিতে তার উল্লেখ আছে। 'সধবার একাদশী' নাটকে 'কালনিমে মামা', 'মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে' ইত্যাদি কথা আছে। কিন্তু সেজন্য দীনবন্ধুর নাটককে মিথ্-প্রভাবিত বলা যায় না। রামায়ণ-মহাভারত আমাদের সত্তার মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে দৈনন্দিন কথোপকথনেও আমরা সে প্রসঙ্গ টেনে আনি।

উনবিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিন্দুমেলা। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭) চৈত্রসংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায় নবগোপাল মিত্র, ঠাকুরবাড়ির সদস্যগণ এবং আরও অনেক শিক্ষিত মানুষ এর উদ্যোক্তা ছিলেন। "প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি বা আন্দোলন পরিচালনার চেয়ে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা-কামনার উদ্দীপনা তথা স্বদেশপ্রীতি এবং ঐতিহ্যগর্বের জাগরণই এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" লেখক এই সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল-প্রণীত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন — "আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য।"[১৪]

এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে ধর্মান্দোলনও খুব বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের তৎকালীন নেতা কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। ভক্ত হন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও। এই কারণে এ যুগের নাটকে যুগপৎ ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের ভাবনা দেখা যায়।

নাট্যকার মনোমোহন বসু হিন্দুমেলার উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "ভারতবর্ষ যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, য়ুরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ" (জাতীয় নাট্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা) বুঝে তিনি নতুন নাট্যাঙ্গিক সৃষ্টি করলেন গীতাভিনয়। এখানে বাঙালি দর্শকের প্রিয় আবেগবাহুল্য ও গীতিপ্রিয়তা নিয়ে আসেন। সংলাপের স্থানে বেশির ভাগ গানই পরিবেশিত হত। অনেকটা পরিশীলিত যাত্রা বলা যায়। তার সঙ্গে তিনি দেখলেন কৃতবিদ্য নব্যদলের দর্শক চান অভিনয়ের নায়ক-নায়িকা হবেন 'নির্মল চরিত্র'। এইজন্য তিনি পুরাণ কথার জগতে প্রবেশ করলেন। রামাভিষেক, সতী, হরিশচন্দ্র, পার্থপরাজয়। আবার তারই সঙ্গে মিশ্রিত

হয়েছে জাতীয়তাবোধ । অবশ্য তিনি সামাজিক নাটক (প্রণয় পরীক্ষা), প্রহসন (নাগাশ্রমের আশ্রম), ঐতিহাসিক নবন্যাস (দুলীদ)ও রচনা করেছেন ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসায় বাংলা নাটকে একটি নতুন যুগ শুরু হল বলা যায় । তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক । ৮০টি নাটক রচনা করেন তিনি । তাঁর প্রবর্তিত গৈরিশ ছন্দ, ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো, এগুলিও সুপ্রযোজ্য ছিল । এই ছন্দ সহজতর, অমিত্রাক্ষরের মতো প্রবহমানতা আছে এবং প্রয়োজনে ভাঙা যায় । সংলাপ রচনার পক্ষে উপযুক্ত ।

গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটক লিখেছিলেন । তার মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' এখনও জনপ্রিয় । 'সিরাজদ্দৌলা'র মতো ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছেন । কিন্তু তাঁর খ্যাতি পৌরাণিক নাটকের জন্য । তিনি লিখেছেন, 'আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কৃপা, আমার কোন গুণ নহে । অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা । পতিতপাবনের অপার দয়া — সেইজন্য আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন । আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তা নাই । জয় রামকৃষ্ণ ।[১৫] রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সকলের জ্ঞাত । ধর্মকেন্দ্রিক নাটক লিখতে ভালোবাসতেন বলে ১৯০৬ সালে লেখা 'বলিদান' নাটক অভূতপূর্ব প্রশংসা লাভ করলেও তিনি অমৃতলাল বসুকে বলেছিলনে, "এ সব (realistic) বিষয় নিয়ে লেখা আর নর্দমা ঘাঁটা এক ।"[১৬] প্রাচ্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই নাট্যকার বলে গেছেন, "জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না । ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম । ভারত ধর্মপ্রাণ, যাহারা লাঙল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট । ..... হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম । মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে ।[১৭]

বস্তুত রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি উত্তুঙ্গে কারণ তিনি জাতীয় বৃত্তিটি ধরতে পেরেছিলেন । এদেশে দর্শকরা নাটক দেখতে আসে শুধু বিনোদনের জন্য নয়, পূণ্য অর্জনের জন্য । এদেশের মানুষ এখনও ধর্মপ্রাণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা আন্দোলনেও তার মূল ভিত্তিটি নড়ে নি এটা বুঝেছিলেন ।

গিরিশচন্দ্র কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে সংস্কৃত নয় পাশ্চাত্য আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য 'ম্যাকবেথ' অতি সফলভাবে মঞ্চস্থ করতে পেরেছিলেন। শেক্সপিয়ারের প্রভাব তাঁর নাটকে যথেষ্ট। সেইজন্য নিয়তিবাদ নয়, মানবিক দুর্বলতা তিনি অস্বীকার করেন নি। তাঁর নাটকের দেবতারাও মানবোচিত, ধরাছোঁয়ার বাইরে নন। ভক্তিরস ও ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, তাঁর নাটকের রস।

কিন্তু পুরাণ-আশ্রিত নাটক মাত্রই মিথ-আশ্রিত নয়। যেখানে পুরাণের প্রতিভাস আসে, সেখানে আসে মিথ। গিরিশচন্দ্র পুরাণের কাহিনী অবিকৃত রেখেছেন এবং মধুসূদনের মতো নতুন মাত্রা সংযোজন করেন নি। রেনেসাঁস তাঁর রচনায় প্রভাব বিস্তার করে নি।

গিরিশচন্দ্রের সাফল্যে সে যুগে অনেক নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং আরও অনেকে। রাজকৃষ্ণ রায় সে যুগে খ্যাতি লাভ করেছিলেন মুলত পৌরাণিক নাটকের জন্য। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাঁদের খ্যাতি প্রায় মিলিয়ে গেছে। এইসব নাট্যকারদের নাট্যরচনার ক্ষমতা থাকলেও নব-সৃজন ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা দর্শকরুচি তৈরি করেন নি, বরং গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখে যশস্বী হলেন বলে এঁরা ভক্তিরস আঁকড়ে থাকলেন। কিন্তু পুরাণের অন্তর্নিহিত সত্য আধুনিক জীবনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করতে পারেন নি। যদিও একদা খ্যাতিমান বলে সংক্ষেপে এঁদের একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ শক্তিশালী নাট্যকার ছিলেন। তাঁর প্রবল অধ্যাত্মবিশ্বাস ছিল। জন্মসূত্রে তিনি তান্ত্রিক বংশের সন্তান। নিজে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। সেইজন্য পুরাণের ঘটনা ও চরিত্র তিনি পুরাণের গাম্ভীর্য থেকে সরান নি। 'উলুপী' নাটকে তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। এবং নাট্যমুহূর্ত সঞ্চারের জন্য কয়েকটি পুরাণ প্রসিদ্ধি বদলিয়েছেন। এখানে নাট্যকার দেখিয়েছেন অশ্বমেধ পর্বে ইলাবন্তের মৃত্যু ঘটেছে, মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। গঙ্গার অভিশাপও তাঁর স্বকপোলকল্পিত। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাই তাঁর সব পৌরাণিক নাটকেই কৃষ্ণচরিত্র আসে। 'নরনারায়ণ' নাটকে তার পূর্ণ প্রকাশ। এটি তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ

নাটক । অর্জুন ও কৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলা হলেও অর্জুনের থেকে কর্ণ এখানে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে । তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে কর্ণের ট্র্যাজিক মহিমা বড়ো করে দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণ ও কর্ণের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিকতাও নাটকটিকে আধুনিকমনস্ক করেছে ।

গিরিশ-পরবর্তী যুগে পুরাণাশ্রিত নাটক রচনার স্রোত অব্যাহত ছিল ঠিকই । তবে সমস্তটাই তাঁর খ্যাতির জন্য তা নয় । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় অনেকগুলি 'দর্পণ' নাটক লেখা হয় । 'জেল-দর্পণ' (১৮৭৫), 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) ইত্যাদি । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি দেশাত্মবোধক নাটক লেখেন । 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', 'শরৎ-সরোজিনী'ও স্বদেশচিন্তার ফসল । এর ফলে শাসকগণ নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল তৈরি করে । বাঙালি চৈতন্য আবার ধাক্কা খেয়ে ধর্ম-পুরাণের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসে । সমালোচক দেখিয়েছেন চেক ভাষাবিদ অধ্যাপক দুশান জবাভিতেলের একটি সারণি[১৮]:-

বছর	সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা	পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা
১৮৭৫	৪৬%	২৫%
১৮৭৬	৩৫%	৩২%
১৮৭৭	৩১%	৫০%
১৮৭৮	২৪%	৬০%
১৮৭৯	১৬%	৭০%

আত্মরক্ষার তাগিদেই এই পরিবর্তন সহজে অনুমেয় ।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্যই খ্যাত, কিন্তু তিনি কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেছেন । এই নাটকগুলিতে তিনি পুরাণের গন্ডি অতিক্রম করে আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । 'সীতা', 'ভীষ্ম', 'পাষাণী' এই তিনটি তাঁর পৌরাণিক নাটক । সেইজন্য পূর্বসুরীদের থেকে তিনি মিথাশ্রিত নাটকে সফলতর ।

'সীতা' নাটকে তিনি রামকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য গুরু বশিষ্ঠকে সর্বাংশে দায়ী করেছেন। বশিষ্ঠ 'শুষ্কং কাষ্ঠং' দয়াহীন মমতাহীন। রাজার একমাত্র কর্তব্য প্রজানুরঞ্জন এই বলে তিনি রামকে দিয়ে সীতার নির্বাসন সম্পন্ন করিয়েছেন। গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়। তাই রামকে তাঁর আদেশ মানতে হয়েছে। কিন্তু এত পত্নীপ্রেমিক যে নিজে সীতাকে এই ভয়ংকর কথা বলতে পারেন নি। বরং সীতাই রামকে মহান আদর্শ রক্ষায় ব্রতী করতে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন।

শম্বুক হত্যাও দ্বিজেন্দ্রলাল সমর্থন করেন নি। ভূমিকাতে সে কথা বলেছেন। শম্বুক তাঁর চোখে ঋষি। এখানেও রাম গুরুর হাতের এীড়নক। তবে বশিষ্ঠের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব রাম কিছুতেই স্বীকার করেন নি। এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। সীতার পাতাল প্রবেশও তিনি আধুনিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। মূল রামায়ণে রাজসভায় দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষার কথা উঠলে সীতা দু:খে লজ্জায় মাতা ধরিত্রীকে আহ্বান করেন। তাকে নাট্যকার ভূমিকম্প রূপে দেখিয়েছেন। যদিও ভূমিকম্পে কখনোই একটি মাত্র ফাটল হয় না।

'ভীষ্ম' নাটকে ভীষ্মকে বড়ো করে দেখানোর চেষ্টায় কখনও কখনও অহেতুক ভাবে ব্যাসকে ছোটো করে দেখানো হয়েছে। যদিও ভীষ্ম ব্যাসকে গুরু বলে স্বীকার করছেন। মহাভারতে দেখা যায় রাজা শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যবতী ভীষ্মের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ নাটকে সত্যবতীকে সাধারণ সৎ-মা'র মতো বিবৃত। ভীষ্মের মানবিকতা দেখাবার জন্য অম্বার প্রতি তাঁর প্রেম ও ব্রহ্মচর্যের দ্বন্দ্ব বেশ আধুনিক মনোভাব।

ক্ষেত্রজ পুত্রের অংশটি নাট্যকার এড়িয়ে গেছেন। অম্বিকা অম্বালিকার সরলতা প্রায় নির্বুদ্ধিতার স্তরে পৌঁছেছে। বুদ্ধিহীন দুই বৃদ্ধার কিশোরীসুলভ আচরণ ও শিশুজনোচিত চিন্তার স্তর বিরক্তিরই উদ্রেক করে। তবে ভীষ্মের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা বাস্তবে নেমে আসে ও সত্যবতীর শরীরে নামে জরা। মূল মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের দ্বন্দ্বের শুরুতেই ব্যাস তাঁর মাতাকে বানপ্রস্থে পাঠান। এখানে তা হয় নি।

'পাষাণী' নাটকটির চিন্তাধারায় বেশ অভিনবত্ব আছে। অহল্যা বাস্তব প্রস্তরে

পরিণত হন নি । জীবনের আঘাত পেতে পেতে তাঁর মন পাথরে পরিণত হয়েছিল, এইটিই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য ।

গৌতম মুনির নীরস জীবন যাপন, শুষ্ক পুঁথির স্তূপ সদ্যযৌবনা অহল্যার কাছে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হয়েছিল । প্রেমলোলুপ ইন্দ্রকে সে সচেতন ভাবে আহ্বান করে । এমন-কি লালসায় উন্মাদ হয়ে নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করতে যায় এবং তার জন্য গ্লানিও বোধ করে না এটাই আশ্চর্য । দীর্ঘ উপভোগের পর ইন্দ্র তাকে ছেড়ে গেলে পুরুষশাসিত সমাজের প্রকৃত রূপটি অহল্যা উপলব্ধি করেন । সন্তানের কাছে মানসিক আঘাত পেয়ে তিনি উন্মাদিনী হন । তাই তিনি পাষাণী । অন্যদিকে গৌতম ক্রোধী নন, ক্ষমার পরাকাষ্ঠা । ইন্দ্রের পরিচয় জেনেও শুশ্রূষা করে ভালো করে তোলেন তাঁকে । এ নাটকে রামের পাদস্পর্শে নয়, রামসীতার পরামর্শে অহল্যা স্বাভাবিক হন ।

দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু আঙ্গিকগত একটি বিশেষ ত্রুটি নাটকগুলিকে দুর্বল করেছে । তিনি তাঁর নাটকে দুরকম বাচনভঙ্গি গ্রহণ করেছেন । শেকস্‌পিয়ার ও সংস্কৃত নাটকের ধারাও তাই । কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী বা পুরুষে এই তফাত করেন নি , করেছেন যাঁর তাঁর প্রিয় চরিত্র নয় তাদের ক্ষেত্রে । সেখানে ভাষা এত লঘু যে কর্ণপীড়াদায়ক । ইন্দ্র চরিত্রে এই দোষ সবচেয়ে বেশি । শাল্ব ('ভীষ্ম' নাটক) চরিত্রেও তার কিছু প্রকাশ আছে । তবু তিনি জাতে ধীবর বলে ভাষার লঘুতা আসতে পারে । কিন্তু ইন্দ্র যত বড়ো লম্পট ততই হাস্যকর তার কথার ধরন । বাল্মীকিও যেন অনেক তরল চরিত্রের হয়ে গেছেন । ('সীতা' নাটক) ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে কোনো প্রচলিত, আনুষ্ঠানিক ধর্মের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন নি । জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্ম পরে এই ধর্মের ঔপনিষদিক ভিত্তি অবলম্বন করে মানবধর্মে উপনীত হয়েছেন । মনে হয়, মধুসূদনের মতো তিনিও ভারতীয় পুরাণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন । বৌদ্ধধর্মেরও অনেক কাহিনী তিনি তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন । মহাভারত থেকে তিনি স্বল্প আলোচিত চরিত্র নিয়েছেন । কুন্তী, গান্ধারী, চিত্রাঙ্গদা, কচ, সোমক । নাট্যকাব্য রচনা করেছেন ।

কর্ণ অবশ্য বাঙালি নাট্যকারদের প্রিয় চরিত্র । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে রচনা করলেন 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' । এ নাটকটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হবে মিথের বিবর্তনের আলোচনাসূত্রে । 'চিত্রাঙ্গদা'ও তাই । পুনরুক্তি যাতে না ঘটে সেইজন্য আপাতত এ দুটি নাট্যকাব্যের আলোচনা থেকে বিরত হওয়া গেল ।

'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর মহত্তম রূপটি তুলে ধরেছেন । মূল মহাভারতে কিন্তু তাঁকে ন্যায়ের প্রতীকী চরিত্র করা হয় নি । বস্তুত মহাভারতের সব চরিত্রই দোষে গুণে মানবিক । কেউই সম্পূর্ণ শ্বেত বা একেবারে কৃষ্ণ নয় । স্বামী জন্মান্ধ জেনে গান্ধারী নিজের চক্ষু আবৃত করলেন । আধুনিক নাট্যকার বলছেন এ তাঁর সতীত্ব নয়, অভিমান । বঞ্চনার ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত এ ব্যবহার ।[১৯] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রণাম করলে আবরণের নীচ থেকে যেটুকু গান্ধারী দেখেছিলেন, সেই নখগুলি 'কুৎসিত' হয়ে যায় ।[২০] সতী স্ত্রীর দৃষ্টি পড়লে কোনো অঙ্গ কুৎসিত হবে কেন এ প্রশ্নের উত্তর মহাভারতকার দেন নি ।

আবার দেখা যায়, কুন্তী একটি পুত্রের (যুধিষ্ঠির) জন্ম দিয়েছেন শুনে গান্ধারী নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিজের সন্তানকে আনেন গর্ভপাত করিয়ে । যাতে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে তার রাজত্ব পাবার কোনো বাধা না থাকে । গর্ভপাতের ফলে লৌহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হল । ব্যাসের উপদেশে শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখা হল । তার থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একশত ভ্রূণ পৃথক হল । সেই ভ্রূণগুলি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রেখে দেবার এক বছর পর দুর্যোধনাদি একশত পুত্রের জন্ম হয় ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিদিন তিনি সকালে সকলকে আশীর্বাদ করতেন 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ বলে । কিন্তু যুদ্ধের শেষে নিঃসন্তান হয়ে কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন । দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে বধ করার পর ভীষ্মকে অভিশাপ দেন । অথচ নিজেই মুক্ত আসরে দ্রৌপদীকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ।

দ্বিতীয় দ্যূত সভার আয়োজন হচ্ছে শুনে তিনি মা হয়ে সন্তানকে পরিত্যাগ করার কথা বলতে মহারাজা হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসেন । এই অংশ মহাভারতে আছে ।[২১]

রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি নিয়ে 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্য রচনা করলেন। এখানে গান্ধারীর চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ মানবধর্ম ও বিচারপ্রথার আশ্চর্য মানদণ্ড তুলে ধরেছেন। বিচারক দূরবর্তী আসনে বিধাতার মতো উচ্চে থাকবেন না। দণ্ডদাতাকে অপরাধীর হৃদয়ের অংশীদার হতে হবে, সমব্যথী হতে হবে, তবেই সুবিচার সম্ভব। তিনি জননী, গর্ভধারিণী, শিশুকে স্তন্যপান করিয়ে প্রতি মুহূর্তে বড়ো করে তোলার তৃপ্তি, আনন্দ উপভোগ করেছেন। তবু বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করবেন না। 'তপতী' নাটকের সুমিত্রার মতো প্রজাদের মঙ্গলকামনায় ব্যক্তিগত মমতা তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। এ কল্যাণ সংসারের জন্য, প্রজাদের জন্য, সর্বোপরি রাজার আত্মিক উন্নতির জন্য। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়েও প্রকৃত সত্তায় পিতা মাত্র। তিনি 'ভিতরে বাহিরে অন্ধ'। পুত্রস্নেহে বিচারের ন্যায়দণ্ড তুলে নিতে পারেন নি। ভীরু রাজাকে গান্ধারীর সামনে থেকে পালাতে হয়েছে।

দুর্যোধন চরিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁকে 'ভিলেন' রূপে আঁকা হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অত্যন্ত স্বাভাবিক যেন তাঁর দাবি। পাণ্ডবদের বীরত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করেন বলেই তাঁদের বিনষ্ট করতে হবে। ঘাসই পারে বক্ষে বক্ষে লীন হয়ে থাকতে, বনস্পতির জন্য বিরাট ব্যবধান চাই। তাই 'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম'। রাজা তিনি হতে চান এবং তার জন্য রামের মতো প্রজানুরঞ্জক হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। "নিন্দা। আর নাহি ডরি ..... / আপামর জনে কহাইব আজ / দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে/ রাজ নিন্দা।" ব্যক্তিগতভাবে তার পাণ্ডবদের ওপর ক্রোধ নেই। 'দূরবর্তী পর' হলে তার কিছু এসে যেত না। কিন্তু এক আকাশে 'দুই ভ্রাতৃ-সূর্যালোক' ধরে না।

আর তার আছে পিতার ওপর অভিমান। পিতৃস্নেহ থেকে যেন তারা চিরনির্বাসিত। পাণ্ডবদের নিত্যগুণগান শুনে পিতা তাদের অসংকোচে ভালোবাসা জানাতে পারেন নি। পিতার স্নেহ ও রাজ্য দুই থেকেই তারা বঞ্চিত।

ভানুমতীও যোগ্য ক্ষাত্রনারী। তিনি আজ দ্রৌপদীর অলংকারে অকুণ্ঠিত হয়ে সেজেছেন। এটি তাঁর অধিকার বলে মনে করেন। দ্রৌপদীর এই অলংকারগুলিও তাঁর স্বামীরা লুণ্ঠন করে এনেছেন। ভানুমতী জানেন জয় এবং পরাজয় উভয়ই ক্ষত্রিয় জীবনের অঙ্গ। মৃত্যুতে যেমন তাঁর ভয় নেই তেমন জীবনের উগ্র মদও তিনি অবহেলা করেন না।

গান্ধারী তাঁর সত্যরক্ষায় অবিচল এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বে পরাজিত এক দুর্ভাগা মানুষ, যাঁর প্রতি করুণা জন্মায়।

'বিদায় অভিশাপে'র কাহিনীটিও মহাভারত থেকে গৃহীত। দেবপুত্র কচ এসেছেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে। দেব দৈত্যে চিরবিবাদ। দেবতারা অমর হলে দৈত্যদের ক্ষতি। তাঁদেরই গুরুর কাছে এ বিদ্যা আহরণ যে কত কঠিন কচকে বোঝানো হয়েছে। তার সঙ্গে এও বোঝানো হয়েছে শুক্রাচার্যের কাছে পৌঁছতে হলে তার প্রিয় পুত্রী দেবযানীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে জয় করতে হবে। 'বিদায় অভিশাপে' রবীন্দ্রনাথ কচকে কখনোই কুটিল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে দেখান নি। কচ, কর্তব্যের জন্য নিজ হৃদয়কে তার অভীষ্ট থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদের অনুচ্চারিত প্রেমকে অপরূপ রমণীয় রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীকে আমরা পেয়েছি পূর্ণ নারীরূপে। সে রাণী এবং শর্মিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা। তিনি স্ত্রী ও মাতার অধিকার দাবি করেন। 'বিদায় অভিশাপে' দেবযানী কিশোরী। সে দয়িতের সামান্য প্রশংসা বাক্যে, সাহচর্যে খুশি। তবু এখানেও তার চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখা যায়। কচকে প্রস্থান করতে দেখে সে সাভিমানে দূরে সরে থাকে নি। বরং তাদের প্রেমকে পূর্ণ মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছে। পুরাণের সম্বরণ-তপতীর কথা বলেছে।

মূল মহাভারতে আছে কচকে দৈত্যগণ বার বার হত্যা করছেন আর শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলছেন। কচকে তৃতীয়বার হত্যার পর সেই দেহ গুঁড়ো করে সুরার সঙ্গে শুক্রাচার্যকে পান করানো হল। দেবযানীর কাতর অনুরোধে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কচকে নবজন্ম দেন। দেবযানী কচকে প্রেম নিবেদন করলে কচ যুক্তি দেন, শুক্রাচার্য তাঁকে নবজন্ম দিয়েছেন বলে তিনি তাঁর পিতা ও শরীরে ধারণ করেছেন বলে, মাতা। অতএব দেবযানী তাঁর সহোদরা। এ বিবাহ সিদ্ধ নয়।[২২] বিদায় অভিশাপে এই সব নৃশংস ঘটনা ও কুযুক্তি নেই। এখানে কচ কর্তব্যের জন্য আত্মবলি দিয়েছেন।

দেবযানী কচের প্রত্যাখ্যানে অপমানিত হয়ে অভিশাপ দেন। মহাভারতের কচও অভিশাপ দিয়েছেন যে তাঁর মুনি ঋষির বিবাহ হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ অভিশপ্ত হয়েও দেবযানীর কল্যাণকামনা করেন। তাঁর চরিত্রে কোনো মালিন্য নেই।

মহাভারতের বনপর্বে আছে রাজা সোমক একশত ভার্যা গ্রহণ করা সত্ত্বেও শেষ বয়সে একটি মাত্র পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। শত পত্নী শিশুটিকে বেষ্টন করে থাকত। রাজাও তাঁর মায়ায় এত আপ্লুত ছিলেন যে রাজকার্য বিঘ্নিত হত। একদিন অন্ত:পুর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি রাজসভা ত্যাগ করে ছুটে চলে যান। ফিরে এসে দু:খ করে বলেন, পুত্রার্থী হবার জন্য তিনি শত কন্যার পাণি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একটি মাত্র পুত্র লাভ করেছেন। ফলে তাঁর প্রাণ তাকেই আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় যদি কেউ বলতে পারতেন, যাতে তাঁর শতপুত্র হয়। তখন রাজপুরোহিত বলেন তিনি একটি যজ্ঞ করতে পারেন যাতে প্রতি রাণী পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু এই পুত্রটিকে আহুতি দিতে হবে। পরে অবশ্য আবার সে জন্মলাভ করবে। তার গায়ে একটি কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। কার্যত সেই যজ্ঞধূমের ঘ্রাণে শত রাণী পুত্রবতী হলেন। কিন্তু এই কাজের জন্য রাজাকে নরকে পতিত হতে হল। এই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নরকবাস' নাট্যকাব্য।

তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না বলে এই যজ্ঞ সার্থক হয়েছিল কিনা তার উল্লেখ করেন নি। তিনি সোমক ও যাজকের চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। রাজার শতপুত্রের আকাঙ্ক্ষা থেকে বড়ো হয়েছিল ক্ষত্রিয়ের অহংকার। "তাই হবে প্রভু / ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।" পরে হাহাকার করেছেন "মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে ..... নরধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম হায় / অনলে করেছি ভস্ম।" যাজকের পাপ আরও বড়ো। রাজা পুত্রের কান্না শুনে দ্রুত চলে যাওয়ায় 'উঠিল জ্বলিয়া। ব্রাহ্মণের অভিমান'। রাজা তাঁকে ঠেলে ফেলে চলে গেলেন, "অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে"। অতএব তিনি সেই শিশুটিকে আগুনে ফেলে প্রতিহিংসা পূর্ণ করলেন। এই জঘন্য মনোবৃত্তির জন্য তাঁকে নরকে যেতে হল। ওদিকে সোমকের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়েছে তাঁর সারা জীবনের অনুতাপ। মৃত্যুকালে শিশুর অসহায় অবিশ্বাসী চোখের দৃষ্টি সারাজীবন তাড়া করে ফিরেছে। ধর্ম তাই বলছেন –

"করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার / অনন্ত নরকানলে
সে পাপের ভার ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে।"

কিন্তু রাজা সোমক যাজককে ত্যাগ করে স্বর্গে যেতে রাজী নন। তাঁর যুক্তি তাঁরও অপরাধ কম ছিল না। তিনি অহংকার প্রদর্শন না করলে পুরোহিত অন্যায় কাজটি করতেন না। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে তিনি মহত্তর হয়ে উঠলেন।

সোমকের পুত্রের নাম ছিল জন্তু। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সুকুমার রুচি এই নাম গ্রহণ করতে পারে নি বলে নামই বর্জন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে –

"আশা করি নামটা হত ওরই মধ্যে ভদ্র মত
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত কিম্বা বসুভূতি।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে পুরাণকাহিনী আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও মানবতাবাদের দ্বারা চিরকালীন করে নিয়েছেন। কাহিনীগুলি তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তার জন্য কিন্তু কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেন নি। তাকে নবীকরণ করেছেন নিজস্ব বোধির দ্বারা।

সূত্র নির্দেশ

১। সুকুমার সেন – নট, নাট্য, নাটক, চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়, পৃষ্ঠা ৬০, মিত্র ও ঘোষ।

২। মনোমোহন ঘোষ – প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা, ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি।

৩। সুকুমার সেন – নট, নাট্য, নাটক, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ৬।

৪। শম্ভু মিত্র – সম্মার্গ সপর্যা, এম·সি· সরকার এন্ড সন্স প্রা· লি· ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩২।

৫। সুকুমার সেন – নট, নাট্য, নাটক, পৃষ্ঠা ৯৬।

৬। সমাচার দর্পণ – ১৪ জুলাই, ১৮২২।

৭। শাঁওলী মিত্র – 'নাট্যশিল্পের উজ্জীবন ও কথকতার ঐতিহ্য একটি চিঠি' জিজ্ঞাসা পত্রিকা। সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন। সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়।

৮। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল – নীতিযুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ। আনন্দ পাবলিশার্স ১৩৯৫, প্রথম সংস্করণ।

৯। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, পুস্তক বিপণী।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র — বাঙালির ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনাসমগ্র, ২য় খন্ড, প্রকাশক মহেন্দ্র নাথ দত্ত, শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রা: লি: তৃতীয় প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৯।

১১। মধুসূদন রচনাবলী — রাজনারায়ণ বসুকে খিদিরপুর থেকে লেখা চিঠি ১৯শে অগাস্ট, ১৮৬২, মডেল পাবলিশিং হাউস।

১২। ভূদেব চৌধুরী — 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং।

১৩। ভূদেব চৌধুরী — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দে'জ পাবলিশিং পৃষ্ঠা ৩৪৩।

১৪। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব — গিরিশ ঘোষ।

দ্রঃ ভূদেব চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পর্ব।

১৫। গিরিশচন্দ্র রচিত পৌরাণিক নাটক প্রবন্ধ, রঙ্গালয় পত্রিকা, ৩০শে চৈত্র ১৩০৭।

১৬। ঐ

১৭। কুমার রায় — 'নাট্যদর্পণে দুশো বছর', দেশ পত্রিকা ১৫ই নভেম্বর আনন্দবাজার প্রকাশনা।

১৮। শাঁওলী মিত্র — 'কথা অমৃত সমান'। এম·সি· সরকার সন্স।

১৯। রাজশেখর বসু — ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ। স্ত্রীপর্ব — গান্ধারীর ক্রোধ, পৃষ্ঠা ৫৫১, এম·সি· সরকার এন্ড সন্স, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭১।

২০। রাজশেখর বসু — ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ। অনুদ্যুতপর্বাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭।

২১। রাজশেখর বসু — ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ। আদিপর্ব, সম্ভবপর্বাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬-২৮।

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ক্ষণিকা কাব্য, সেকাল কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮৭।